বেলার জন্য সারা বেলা

আহমেদ সাবের

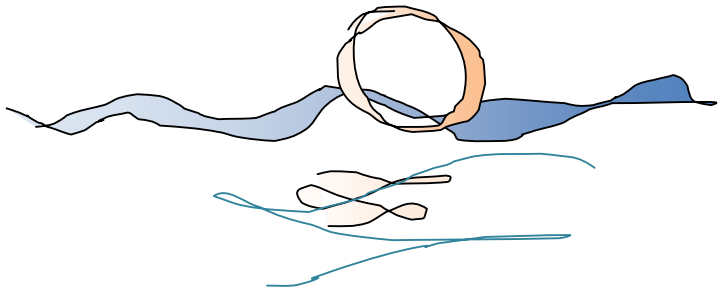

-১-

পেলিক্যান ফিডিং হয়ে গেছে একটু আগে। এই ছোট্ট টুরিস্ট শহরটার সব চেয়ে বড় আকর্ষণ। প্রতিদিন অপরাহ্ণ পৌনে তিনটায় এখানকার ব্যবসায়ীরা পেলিক্যানদের জন্য ভুরি-ভোজনের আয়োজন করে। তারই লোভে দুপুরের পর থেকেই পাখী গুলো একে একে এসে জড়ো হতে থাকে ফেরিঘাটে। ঠিক ঘড়ির কাঁটা ধরে কয়েক ধামা তাজা মাছ আনা হয় ঘাটে। একেকটা মাছ ছুড়ে দেয়া হয় ওদের দিকে আর সাথে সাথে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় পেলিক্যানগুলোর মধ্যে। প্রতিবারেই যে জেতে, বিরাট হা করে মাছটা মুখে নিয়ে নিমেষে চালান করে দেয় লম্বা ঠোঁটের সাথে ঝুলন্ত বিরাট ঝুলিতে। প্রায় আধাঘণ্টা চলে এই উৎসব। এই মহোৎসব দেখার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে আসা ভ্রমণকারীরা প্রতিদিন সমবেত হয় শহরটায়। ক্যামেরা চলতে থাকে অবিরাম ক্লিক ক্লিক করে। খাবার শেষে পেলিক্যানরা একে একে ফিরে যায় সাগরে আর দর্শনার্থীরা ফিরতে থাকে নিজস্ব গন্তব্যে।

নামে ফেরী ঘাট হলেও যায়গাটায় ফেরী ভিড়ে না ব্রিজ হবার পর থেকে। তা হলেও যায়গাটা ঘিরে গড়ে উঠা দোকানগুলো রয়ে গেছে। স্থানীয় লোকদের পেলিক্যানে আকর্ষণ না থাকলেও ওরা টিকে আছে টুরিস্টদের খাতিরে। পেলিক্যান দেখতে টুরিস্টরা আসে আর সেই সুবাদে টিকে আছে স্থানীয় ব্যবসাগুলো। তাই সমুদ্রে দেদার খাবার থাকা স্বত্বেও বছরের পর বছর ঘড়ি ধরে চলছে পেলিক্যান ফিডিং।

আজ রোববার। খাবারের দোকান ছাড়া প্রায় সব দোকানই চারটার দিকে বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ পেলিক্যান ফিডিং 'এর পর থেকেই বেশীর ভাগ টুরিষ্টরা ঘরে ফিরতে শুরু করে। পরের দিন সোমবার – সবার কাজের দিন। শুধু শনি আর রবিবার শহরটা সর-গরম থাকে। বাকী দিন গুলো গড়িয়ে যায় অজগরের মত, ধীরে সুস্থে। আমি স্যাম, দোকান বন্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি। ডার্ট-মার্ট নামের এই টু-ডলার শপটা যেমন আমার নিজের নয়, তেমনি নয় স্যাম নামটাও। আমার নানার দেওয়া নাম সামিয়ান হক, এন্ট্রেন্স নামের অস্ট্রেলিয়ার এই ছোট্ট শহরে স্যাম চাকুরীতে লুপ্ত হয়ে গেছে অনেক আগে। এন্ট্রেন্স মানে প্রবেশ। কিসে প্রবেশ? কি অদ্ভুত নাম শহরটার। আমি ভাবি মাঝে মাঝে। শহরটার একদিকে চিত্তাওয়ে উপসাগর আর অন্য দিকে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে বের হয়ে আসা তাসমান সাগর।

রাস্তায় গাড়ির হঠাৎ করে ব্রেক কষার বিকট শব্দ শুনে চোখ না তুলেই বুঝলাম, বেন এসেছে। বেন হল এই দোকানের মালিক কার্লোসের কন্যা মারিয়ার বয় ফ্রেন্ড। প্রতিদিন প্রায় এ সময়টাতেই সে সত্তর কিলোমিটার দূরের অয়েষ্টার ফার্ম থেকে মারিয়ার জন্য ছুটে আসে ঝড়ের বেগে পিক-আপ চালিয়ে। দোকানের সামনে এলেই হঠাৎ করে ব্রেক চাপে, যেন আগে থেকে জানা ছিল না, এখানে থামতে হবে। এই মানুষটার সব কিছুতেই অস্থিরতা; শুধু মারিয়ার সামনে ছাড়া। তখন উত্তাল সমুদ্র শান্ত-সমাহিত হ্রদ। মাথার হ্যাটটা খুলে হাতে নিয়ে দোকানের সামনে দাঁড়াতেই আমি ওকে উদ্দেশ্য করে বলি,

মারিয়া তোমাকে বলেছে "টু গেট লস্ট"।

সে আর নতুন কি? আমি তো অনেক আগেই লস্ট। হাসতে হাসতে বলে বেন।

ওর গলা শুনে বেরিয়ে আসে মারিয়া। বেনকে আলিঙ্গন করে বলে - দেখ, ডেডীর শরীরটা ভাল না। আমি আজ তাকে দেখতে যাব। তোমার সাথে যাওয়া হবে না।

চল, আমিও যাব তোমার সাথে। ওল্ড ম্যানকে দেখা হয়নি অনেকদিন।

তা হলে একটু অপেক্ষা কর। আমার আরও ঘণ্টা খানেক লাগবে। আমি তোমার গাড়ীতে যাব। স্যাম আমাদের পিক-আপ নিয়ে পরে আসবে। কি স্যাম, ঠিক আছে?

অবশ্যই। আমি উত্তর দেই।

তা হলে আমাকে কিছু খেয়ে আসতে হবে। ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে। তোমাদের জন্য কিছু নিয়ে আসব?

আসার পথে দুটো কফি নিয়ে এস প্লিজ।

-২-

কাজ করতে করতে বাইরে তাকাই। ফেরী ঘাটের সামনের বাগানে এখনো অনেক লোক। বাচ্চারা ছুটাছুটি করছে পামট্রির ছায়ায়। অনেকে ছবি তুলছে - চলে যাবার আগে শেষ ছবি। অবশ্য যায়গাটা ছবি তোলার জন্য আকর্ষণীয় বটে। পেছনে তাসমান সাগরের বিশালতা। এখানে সেখানে ভেসে বেড়াচ্ছে পেলিক্যানের ঝাঁক। শীতের সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে; ঘণ্টা খানেক পরে টুপ করে ডুবে যাবে

চিত্তাওয়ে উপ-সাগরে। পাম গাছের পাতায় রোদের ঝিকিমিকি। এখানে সেখানে মৌসুমি বাহারি ফুলের সযত্ন লালিত ঝোপ। কত দেশের কত ধরনের লোক। ইউরোপিয়ান, চায়নিজ, ভারতীয়, সাউথ আমেরিকান, সাদা, বাদামী, কালো। তিনটা ভারতীয় মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় কি? বাংলাদেশীও হতে পারে। হয়তো কোন পরিবার ডে-ট্রিপে এসেছে। একটা ছেলেকেও দেখা যাচ্ছে ওদের সাথে। দুটো মেয়ে আর ছেলেটা একটা ফুলের ঝোপের সামনে সার বেধে দাঁড়াল তাসমান সাগরকে পেছনে ফেলে। অন্য মেয়েটা ওদের ছবি উঠাচ্ছে ক্যামেরায়, আমাকে পেছনে রেখে।

আরে, ক্যামেরা-ধারী মেয়েটা দেখছি শাড়ি পরা! অনেক ভারতীয় বেড়াতে আসলেও শাড়ি পরা তরুণী মহিলা আমার চোখে পড়েনি কখনো। অবশ্য শাড়ী পরা বয়স্কা মহিলা চোখে পড়ে মাঝে মধ্যে। তরুণীরা হয় শালোয়ার-কামিজ কিংবা শার্ট-প্যান্ট-স্কার্ট পরে। পেছন থেকে চেহারাটা না দেখা গেলেও শারীরিক কাঠামোতে শাড়ী পরিহিতা মেয়েটাকে তরুণী বলেই মনে হচ্ছে। তার পরনের শাড়ীটা বেশ উজ্জ্বল নীল রঙের । মেয়েটা এমন সেজে গুজে কি মধুচন্দ্রিমায় এসেছে? সাথের ছেলেটা কি ওর বর? এ ধরনের কত মেয়েই তো বেড়াতে আসে এখানে। আমার কি সময় আছে সবাইকে দেখার? তবে, শাড়ী পরা মেয়েটাকে দেখবার পর থেকে কৌতূহলে ওদের উপর চোখ যাচ্ছে বারবার।

দলটা আমার আরেকটু কাছে এগিয়ে এসেছে। একটা পাম গাছের আড়ালে পড়ে যাবার ফলে তিনটা মেয়ের মধ্যে একটাকে দেখা যাচ্ছে এখন। ছেলেটাকেও দেখা যাচ্ছে সাথে। মনোযোগ দিয়ে চেহারা বিচার করে আমার মনে হল, ওদের বাংলাদেশী হবার সম্ভাবনাই বেশী। মেয়েটার শালোয়ারের লাল-সবুজের ডিজাইন বাংলাদেশের হবার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ।

বেন এসে দোকানের কাউন্টারে রাখল কফির কাপ দুটো। শব্দ শুনে মারিয়া দোকানের পেছন থেকে কাউন্টারে এলো। বেনকে ধন্যবাদ দিয়ে একটা কফির কাপ আমার হাতে তুলে দিয়ে চুমুক বসাল নিজের কাপে।

আমি কফির কাপটা ঠোটে ছোঁয়াতেই একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল পার্কটার গা ঘেঁষে। একটা ছেলে গাড়ীর জানালা থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠার ইঙ্গিত করল। কারণ যায়গাটা নো-পার্কিং জোন। ওর ডাক শুনে ছেলেটা তাড়াতাড়ি এসে সামনের সীটে উঠল। শালোয়ার পরিহিত দুটো মেয়ে উঠলো পেছনের সীটে। শাড়ী পরা মেয়েটা পেছনের সীটে উঠতে গেলেই ওর মুখটা নজরে পড়ল আমার। সাথে সাথে একটা বৈদ্যুতিক শক খেলাম আমি। অবিকল বেলার চেহারা। না না, এ তো বেলা। বেলা এখানে? আমি স্বপ্ন দেখছি নাতো? গাড়ীর দরজা বন্ধ হতেই আমি নিজের অজান্তে কফির কাপটা হাতে নিয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম। গাড়ীটা পার্কের গা ঘেঁষে একটা বাঁক নিয়ে লোকজন দেখে শুনে ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি পাগলের মত গাড়ীটার পিছন পিছন ছুটতে লাগলাম। লোক জনের ভিড় পেরিয়ে আসতেই গাড়ীটা সবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বেলে দিলে যেমন করে ঘরের সব জিনিষপত্র হঠাৎ দৃশ্যমান হয়ে উঠে, তেমনি করে আমার মনের গহীনে কেউ যেন লক্ষ ভোল্টের একটা আলো জ্বেলে দিল হঠাৎ করে।

আমার মনে পড়ে গেল অনেক অতীতে ফেলে আসা পিতার ক্রুদ্ধ মুখ। রাত এগারটার দিকে আমি ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমার নীতিবাগীশ বাবা মনোলগে বলে গেলেন শোনা ঘটনা - আমাদের থানা শহরে একজন যুবক খুন হয়েছে। স্থানীয় ও,সি, বাবার এককালীন ছাত্র বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা বশে খবরটা জানিয়েছেন যে খুনিদের নামের তালিকায় আমার নামটাও আছে এবং আমাকে গ্রেফতারের প্রস্তুতি চলছে। বাবার পরিচিত কয়েকজন ঘটনার সাক্ষী। ঘটনার রাতে ঘটনাস্থলে আমাকে দেখা গেছে।

ঘটনার সত্যতা জানতে চাইলেন না বাবা। ক্রুদ্ধ আক্রোশে তার জুতো সপাৎ সপাৎ শব্দে আঘাত হানছে আমার পিঠে। এক সময় জুতোর যায়গা দখল করে নিলো কাপড়ের আলনায় ঝোলানো চামড়ার বেল্ট। আমার গায়ের পোশাক চিহ্ন-ভিন্ন। পিঠ থেকে রক্ত পড়ছে মোজাইক করা মেঝেতে। মা আমাকে আগলে ধরতে এলেন ছুটে। বাবার দুটো ক্রুদ্ধ হাতের ধাক্কায় মায়ের মাথায় ডাইনিং টেবিলের কোনে লেগে কেটে গেলো। পিতার বলিষ্ঠ কণ্ঠে খুনি ছেলেকে ত্যাজ্য পুত্র ঘোষণার বজ্র-নিনাদের সাথে বাবার নিজেদের শোবার ঘরে প্রস্থান।

আমি মায়ের মাথায় তোয়ালে চেপে ধরে বসে থাকি নির্বাক হয়ে। রাত্রি গভীর হতে থাকে। অনেক রাতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মায়ের প্রশ্ন, সজীব, তুই কি খুনিদের সাথে ছিলি?

না মা, না। না, না, না। আমি কিছুই জানি না।

আমার চোখে চোখ রেখে বল।

না মা, না। না, না, না। আমি কিছুই জানি না। আমি আবার বলি।

আমি জানতাম, আমার ছেলে কখনো খুনি হতে পারে না। কিন্তু নাম যখন দিয়েছে, থানা-পুলিশ তোর জীবনটা ধ্বংস না করে ছাড়বে না। তুই পালা সজীব, তুই পালা। এদেশে খুনিরা ছাড়া পেয়ে যায় আর নিরপরাধরা শাস্তি পায়। যদি পারতাম, তবে তোর বাবার মত একটা হৃদয়হীন মানুষের সংসারকে লাথি মেরে আমিও তোর সাথে চলে যেতাম। কিন্তু আমি গেলে তোর ছোট দুটো ভাই, বোনকে কে দেখবে? এই নরক থেকে আমার মুক্তি নাই। সব মায়ার বন্ধন কেটে তুই চলে যা সজীব। চট্টগ্রাম পোর্টে তোর মামার কাছে যাবি। সে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

সে রাতেই আমি পালাই। মায়ের কাছে কথা দিয়ে এসেছি, আর কোনদিন যোগাযোগ রাখবো না তাদের সাথে।

চট্টগ্রাম আসার দিন সাতেক পর আমি ফোন করি বেলাকে। যে কণ্ঠের যাদু আমাকে দিনের পর দিন মোহাবিষ্ট করে রাখত, সে কণ্ঠ যেন ফুটন্ত সীসা ঢেলে দিল আমার কানে।

তোর এত বড় সাহস, তুই আমার ভাইকে খুন করে আমাকে আবার ফোন করিস। পালিয়ে আছিস কোথায়? ভেবেছিস পালিয়ে রক্ষা পাবি। যেখানেই পালাস, ধরা একদিন পড়বিই। জানিস না আমাদের হাত কত লম্বা। যত দুরেই যাবি, তোকে গলায় দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে আসব। তোর মুখে আমি থু থু ফেলি ...।" যেদিন তোর ফাঁসি হবে, সেদিন রাজীব ভাইয়ার আত্মা শান্তি পাবে .....।

বেলা, আমার শুধু একটা কথা .....।

আমার কথা শেষ হবার আগেই লাইন কেটে যায়।

মামা আমাকে তিন মাস লুকিয়ে রেখে পরিচিত এক বিদেশী জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ধরে ভাসিয়ে দেন নিরুদ্দেশের পথে। তার আরও প্রায় একমাস পরে সেই জাহাজ ভেড়ে অস্ট্রেলিয়ার এক বন্দরে আর আমি পা রাখি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। নানা শহরের পানি খেয়ে অবশেষে নোঙ্গর ফেলি এই ছোট্ট শহরটায়।

-৩-

আমি জানতাম, তুমি এখানে থাকবে। পেছনে মারিয়ার গলা শুনে চমকে উঠি আমি। আর্চবোল্ড রোডের শেষ মাথা টাগরা প্যারেড পেরিয়ে চিত্তাওয়ে উপসাগরে শেষ হয়েছে। সেখান থেকে প্রায় আধা কিলোমিটারের মত একটা কাঠের পাটাতন সাগরের মাঝখানে এসে শেষ হয়েছে। পাটাতনের শেষে একটা গোল ঘর। এখানে আসলে মনে হয় যেন সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। দিনের বেলা যায়গাটা লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে মন খারাপ লাগলে আমি এখানে আসি রাতের বেলা। এখন রাত; এখানে আর কেউ নেই আমি আর মারিয়া ছাড়া।

মেয়েটা কে?

আমি চুপ করে থাকি।

মেয়েটাকে দেখবার পর তোমার চোখে যে আলোর দীপ্তি দেখেছি, তাতে মনে হয় সে তোমার অনেক কাছের কেউ। তোমাকে এক সময় অনেক কাছে পেতে চেয়েছিলাম। অবাক হয়েছিলাম তোমার নির্লিপ্ততায়। ভেবেছিলাম, তুমি বোধ হয় সমকামী। কিন্তু অনেক লক্ষ্য করে, তারও কোন ইতিবাচক ইঙ্গিত পাইনি অবশেষে। আমার ডাকে কেন সাড়া দাওনি, প্রশ্নটা বুকের মাঝেই থেকে গেছে এত বছর। উত্তর আর মেলেনি। এই মেয়েটাই কি তোমার উপেক্ষার কারণ। বল স্যাম, বল। ও কি তোমার অনেক কাছের কেউ?

সে আমার অনেক অনেক কাছের আবার অনেক অনেক দুরের। আমাদের রাত্রি-দিন, বর্তমান-ভবিষ্যৎ, ভাল লাগা-মন্দ লাগা, একদিন সব ছিল এক সূত্রে গাঁথা .....। নীরবতা ভেঙ্গে আমি বলে যাই আমার পঁচিশ বসন্তের জীবনের ফেলে আসা দিন গুলোর কথা, বাবার রুদ্র ভৈরবী মূর্তির কথা, মায়ের অসহায়তার কথা, আমার শরীর জুড়ে বেলার ঘ্রাণের কথা, ওর ঘৃণার কথা। আমার আশার কথা, নিরাশার কথা। আনন্দ বেদনার কথা।

এত কিছুর পর, এখনো কি তুমি কি তাকে ভালবাস?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়াই।

আর সে?

জানি না মারিয়া, জানি না। তা কথা তো আর জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম না।

তুমি কি তাকে হৃদয় থেকে চাও।

চাই। কিন্তু কি হবে আর চাইলে? পথ ভুলে সে হয়তো এসেছিল এখানে। আবার পথেই হারিয়ে গেছে।

তোমার চাওয়ার যদি জোর থাকে, তবে অবশ্যই তুমি তাকে খুঁজে বের করতে পারবে।

কি হবে তাকে খুঁজে। সে হয়তো কারও প্রেমিকা, কিংবা বাগদত্তা, অথবা কারও স্ত্রী।

তোমরা যদি পরস্পরকে ভালবাস, তবে সে সম্পর্ক মূল্যহীন।

সেতো আমাকে ঘৃণা করে।

সে ঘৃণা ভুলের উপর দাঁড়িয়ে। ওর ভুল ভেঙ্গে দেবার দায়িত্ব তোমার।

কি করে ভাঙ্গবো ওর ভুল? কি করে খুঁজবো তাকে মারিয়া এই বিশাল দেশটায়?

একটা দেশে একটা মানুষকে খুঁজে বের করা কিছুই নয়। এই বেনকেই দেখ। আমি সিডনী ছেড়ে চলে এলাম। সে ঠিকই খুঁজে বের করেছে আমাকে। এক সময় আমি তোমাকে চেয়েছিলাম, পাই নি। কারণ এখন বুঝলাম, বেলার প্রতি তোমার ভালবাসা ছিল তোমার প্রতি আমার ভালবাসার চেয়ে অনেক অনেক শক্তিশালী। আমি হেরে গেলেও, এ হারে আনন্দ আছে। বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে মারিয়া।

গোল ঘরের চারপাশ খোলা। কোন দরজা জানালা নেই। শো শো করে বাতাস বয়ে যায় ক্ষিপ্র অশ্বারোহীর মত। সমুদ্র গর্জন বাড়ে। জোয়ার আসছে বোধ হয়।

তোমাকে দেখে বুঝলাম, বেনের প্রতি কি অবিচার আমি করেছি। ওর ভালবাসার গভীরতা বুঝতে আমার এতদিন লাগল। আমার সকল অবহেলা সহ্য করেও দিনের পর দিন এত দুরের রাস্তা পাড়ি দিয়ে আসে আমার সাহচর্য পাবার লোভে। এই সাহচর্য দেহজ নয়। আমার মা ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। মরার আগ পর্যন্ত আমাকে বলে গেছেন, বিয়ের আগে ওসব নয়। মায়ের সে আদেশ এখনো মেনে চলছি। তবু বেন আসে। আমাকে প্রপোজ করেছে কয়েকবার। আমি সাড়া দিইনি।

আমার বাহুবন্ধনে হু হু করে কেঁদে উঠে মারিয়া। সমুদ্র গর্জনে মিশে যায় ওর কান্নার শব্দ।

বেন কি চলে গেছে? আমি প্রশ্ন করি মারিয়াকে।

না যায়নি। তোমার সাথে দেখা করে তারপর যাবে। কান্না ভেজা কণ্ঠে বলে মারিয়া। ওকে খবর দিয়েছি তুমি এখানে আছ। ওই দেখ, সে আসছে। আঙ্গুল বাড়িয়ে সামনে দেখায় সে।

সামনে তাকিয়ে দেখি, কাঠের পাটাতনের প্রান্ত সীমা থেকে একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে। মূর্তিটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। চারিদিক জুড়ে থই থই জ্যোৎস্না। সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় জ্বলছে জ্যোৎস্নার দীপাবলি। আমি মারিয়াকে জড়িয়ে ধরে ছায়ামূর্তিটার জন্য অপেক্ষা করি। ধীরে ধীরে সেটা মানুষ হয়ে যায়।

হোয়াটস গোয়িং অন হিয়ার! আমাদের বাহু-বন্দী যুগল মূর্তি দেখে অবাক হয় বেন।

নাথিং সিরিয়াস ম্যান। আমি বলে উঠি। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্রপোজ হার, দিস ইজ দ্যা মোমেন্ট। প্রপোজ হার নাউ। সি উইল সে ইয়েস। প্রপোজ হার বেন, প্রপোজ হার, প্রপোজ হার .....। আবেগে আমার কণ্ঠ কেঁপে কেঁপে উঠে।

আকাশ থেকে জোৎস্নাধারা পড়তে থাকে বৃষ্টি ধারার মত। আমি মারিয়ার হাত ছাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাই। গোল ঘর আর ডাঙ্গার মাঝামাঝি এসে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, মারিয়ার সামনে এক হাঁটু গেড়ে দু হাত উপরে তুলে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে আছে বেন। আমি ওদেরকে পেছনে ফেলে, গোল ঘরকে পেছনে ফেলে, মাথায় জ্যোৎস্নার প্রদীপ পরা লক্ষ লক্ষ ঢেউ'এর ফণাকে পেছনে ফেলে, দূরে নোঙ্গর করা জাহাজকে পেছনে ফেলে, সমুদ্রের উপর ফুটে থাকা তারাদের পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাই। বেলার ছবি পৃথিবীর উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলজ্বল করতে থাকে আমার চোখের উপর। ওর নীল শাড়ি বাতাসে পতপত করে উড়তে থাকে সুবর্ণ পতাকার মত।

ধীরে ধীরে শীতের কুয়াসা শহরটাকে ঢেকে দেয় সাদা মসলিনের ফিনফিনে চাদরে। আমি আচ্ছন্নের মতো হাটতে থাকি, সাপের মতো শুয়ে থাকা কালো পীচের পিচ্ছিল রাস্তা ধরে, একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাম্পপোস্টের সারির পাশ কাটিয়ে। বেলার মুখ ল্যাম্পপোস্টের বাতি হয়ে যায়। আমি হাটি আর হাটি। অনেক অনেক পর কুয়াশার সিঁড়ি বেয়ে বেলা রাস্তায় নেমে এসে আমার হাত ধরে। আমরা কোন কথা বলি না। এই ছোট্ট শহরটার রূপোলী পথ ধরে নিঃশব্দে হেঁটে যাই অনন্তের পথে .....একটা ভোরের প্রতীক্ষায়।

সিডনী, আগস্ট ১০-১৮, ২০১২